বাংলা গজল: নজরুল এবং অন্যান্য

সোহেল ইমাম খান*

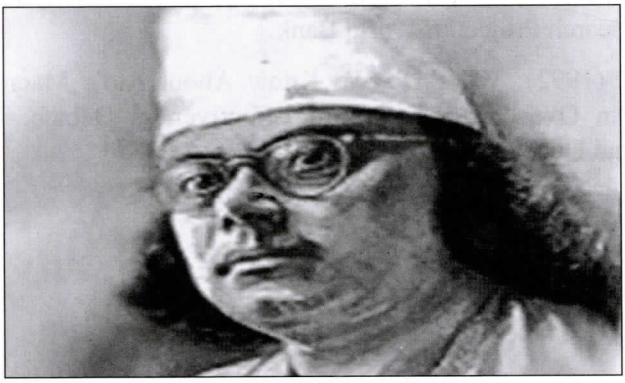

সারাংশ: বাংলা সাহিত্যাঙ্গণে গজলের পদচারণা প্রাচীন তো নয়ই তা দৃপ্তও নয়। গজলের ধারায় রুবাইকে ধরা হলে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সম্ভাবশতক'কে প্রথমদিকের পথপ্রদর্শক বলা চলে। তবে তাতে দয়িতার প্রতি প্রেম নয় বরং ঈশ্বরীয় চেতনায় তা ভরপুর ছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র হাফিযের অনেক গজল গদ্যানুবাদ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হাফিজের গুনমুগ্ধ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রবাই ঢঙে 'কনিকা', 'ক্ষণিকা রচনা করেছিলেন। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়া ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ করে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন।

তবে বাংলায় গজলের প্রথম পথিকৃত ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। লখনৌ-এ থাকার কারণে মুশায়েরায় উপস্থিত থেকে ঠুংরী, গজল, শোনবার সুযোগ তার ছিল। 'কত গান তো হলো গাওয়া'-তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল। তবে তাঁর গজলের সংখ্যাল্পতা এবং বাংলা থেকে দূরে অবস্থানের কারণে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়নি।

সকল দিক বিবেচনায় কাজী নজরুল ইসলামকেই বাংলা গজল যুগের প্রবর্তক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তিনি ১০০টির মত গজল লিখেছিলেন, সুরারোপ করেছিলেন, গেয়েছিলেন এবং গাইয়েছিলেন। বিড়ি শ্রমিক থেকে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জ-শহরের ড্রয়িংরুম পর্যন্ত তাঁর গজল জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি ফারসী গজলের অনুবাদ, ফারসী অনুষঙ্গ ব্যবহারে ও প্রভাবে রচিত গজল, ইসলামী ভাবধারায় রচিত গজল এবং বাংলা গজল রচনা করেছিলেন। দিলিপকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, সাহানা দেবী, আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা বা কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে গজলগুলি হয়ে উঠেছিল সর্বজনপ্রিয়। প্রাণমাতানো রাগ-রাগীনি ব্যবহারে গজলের আদি কাঠামো ও অনুষঙ্গ ব্যবহার করে যে গজলগুলি তিনি রচনা করেছিলেন তাতে গজল ছাড়া আর কোন সঙ্গীত রচনা না করলেও বাংলা সঙ্গীত গগনের ধ্রুবতারা রূপে পরিগণিত হতেন বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন। এরপর বাংলাভাষায় গজলের যে চর্চা তা বিচ্ছিন্ন এবং তার প্রভাবও বিস্তৃত নয়।

*পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকাঃ

১. মানুষের উচ্চ মননশীলতার নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সঙ্গীত । বিপুলা পৃথ্বি ধারণ করে আছে বহু বর্ণের মানুষের বর্ণিল সব কথামালা, সুর, সঙ্গীত । তাতে সন্নিবেশিত আছে বিচিত্র সব ভাব-ভাষা-রস-সংস্কৃতি । সঙ্গীতের এই মহাসমুদ্রের জলরাশিতে রয়েছে অসংখ্য ধারার সুর-কথার নদ-নদী-সাগর । এ বিশালত্বে অবিরাম জলসিঞ্চন করে চলেছে একটি মিষ্টি ও চিরসবুজ স্রোতস্বিনী যার নাম গজল ।

চিরসবুজ এই মিষ্টি নদীতে দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস চিরবহমান, বসরাই গোলাপের নির্যাস হতে উদ্ভূত সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে অবিরাম গেয়ে চলে গানের বুলবুলি । সঙ্গীতের অন্যান্য ধারার সংগে তাই তার পার্থক্য রয়েছে । রয়েছে বিশিষ্টতা ।

২. গজল মূলত: গীতিকবিতা । প্রথমত: এটি আবৃত্তির জন্য লেখা এবং পরে কাঠামোগত সুবিধাকে ব্যবহার করে তাতে সুর সংযোজন করায় তা আরও আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়েছে পাঠক ও শ্রোতার কাছে । সেই প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন আরব্য গাঁথা থেকে এই কাঠামোবদ্ধতার বিষয়টি উত্থিত হয়ে পারস্যে এসে আরও সুসংবদ্ধতায় তার থিতু হওয়া এবং পরে উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষা, দেশ ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে চলা ।

৩. বাংলা গানের সংক্ষিপ্ত কথকতাঃ

বাংলা কবিতা তথা গানের আদি নির্দশন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা চর্যাগীতি । এগুলো হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা যা ৯৫০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে রচিত । সমসাময়িক নাথগীতি নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মমত নিয়ে আখ্যানমূলক রচনা যা রাগের ব্যবহার থাকলেও ছড়ার মতো করে গাওয়া হতো । এরপর আসে বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের (১১৭৮-৭৯ সনে সিংহাসনে আরোহন করেন) সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যা রাধা-কৃষ্ণ'র মিলনলীলা নিয়ে গীতগ্রন্থ । গীতগোবিন্দের দুটি গায়নরুপ ধ্রুপদাঙ্গ গান ও শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে কীর্তনাঙ্গে গীত হয়ে থাকে । এরপর বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের মঙ্গলগানের হাত ধরে বাংলাগান প্রবেশ করে রামপ্রসাদ সেনের শাক্তগীতিতে । বাঙালী জাতি বড়ই আবেগপ্রবন এবং স্বভাবতই প্রেমপ্রবণ । প্রেমের কথা যেন তার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে' । তাই বাঙালী বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের পদাবলীর রসাস্বাদে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে । এরপর রামনিধিগুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯খ্রী.) বা নিধুবাবু আধ্যাত্মিকতার আবরন ভেদ করে মানব মানবীর প্রণয়ানুভূতি নিয়ে রচনা করেন টপ্পা । বাংলা গানের আধুনিকতার এখানে শুরু । নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সুদীর্ঘকালে টপ্পার ভেতর দিয়েই বাংলা গানে মানুষের হৃদয়ের আসনটি স্থায়ী হয় ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা গান ও গজলঃ

১. বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় গজলের পদচারনা খুব প্রাচীন নয়। তবে পারস্য কবি হাফিজের 'রুবাইয়া' কে যদি বৃহত্তর অর্থে গজলের ধারায় স্বীকৃতি দেয়া হয় তবে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬খ্রী.) এর 'সদ্ভাবশতক' (একশতটি সুন্দর ভাবনার পদ্য) কে এ ধারার প্রথম দিককার পথপ্রদর্শক হিসেবে গন্য করা চলে । কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার নিজেও পারস্য কবি হাফিজের গুনমুগ্ধ ছিলেন। উনিশ শতকীয় এই কবি, হাফিজের ভাবে ভাবিত হয়ে তৎসৃষ্ট গজলধর্মী রুবাইগুচ্ছের অনুসরনে 'সদ্ভাবশতক' নামের কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন ১৮৬১ সালে। তবে এর রচনাগুলি আদৌ প্রেমমূলক ছিলনা, ছিল প্রচন্ড রকমের নীতিমূলক, কখনো কখনো ঈশ্বরীয় চেতনায় ভরপুর। রুবাই-এর দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতাজ্ঞ্যপক অবস্থান-অর্থাৎ ইচ্ছা করলে একই রচনাকে ঈশ্বর স্তোত্র অথবা দয়িতার প্রতি প্রেম নিবেদন ভাবার দ্বৈততা-কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতায় খুঁজে পাওয়ার জো ছিলনা, কেননা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকটভাবে ছিলেন একজন ব্রাহ্মভাবাপন্ন সুনীতিবাদী আচার্য স্থানীয় ব্যক্তি । তাঁর দৃষ্টিতে নীতির যে স্থান ছিল, প্রেমের স্থান ছিল তার অনেক নীচে কিংবা প্রেমের আদৌ কোন স্থান ছিল না তাঁর জীবন পরিকল্পনার ছকের ভিতর। [১] কিন্তু তাঁর রচনা, পড়ার পাশাপাশি গান হিসেবে গাওয়াও হতো কিনা তা জানা যায় না।

'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন হাফিযের ভক্ত ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ও আনুকূল্যে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নব-বিধানের পক্ষ হইতে হাফিযের অনেকগুলি গযলের গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন'। [২]

২. রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫খ্রী.) নিজেও হাফিজের গুনমুগ্ধ ছিলেন। তবে তাঁর মুগ্ধতা পারস্য কাব্যের স্বাদ নেয়ার বিষয়ে যতটা, ততটা নিজ গজল কম্পোজিশনে ছিলনা । তাঁর বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত (ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক সংগীত) প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব সম্পর্কে বলছেন, 'বৈষ্ণব ধর্মমত ও পদাবলী আমার পিতার হৃদয়কে অধিকার করে নাই সে আমি জানি। তাঁহার রসভোগের সখা ছিলেন হাফেজ। তিনি নিজে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই আকাঙ্খা মিটাইয়া ছিলেন হাফেজের গানে। উপনিষৎ তাঁহার ক্ষুধা মিটাইত আর হাফেজ তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল', '(প্রবাসী, ১৩৩৩ সন, ২য় খন্ড, ১৯৯ পৃঃ)। [৩] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাগরময় ঘোষ বলেছেন, 'তিনি বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর মুগ্ধ শ্রোতারূপে বহু গান শুনেছিলেন। কবির জীবনস্মৃতি থেকে জানতে পারি বাল্যকালে তিনি দেখেছেন লর্ড সিনহার বংশের আরবী-ফারসী পড়া শ্রীকণ্ঠ সিংহ সর্বদা রাগসঙ্গীত ও গজল নিয়ে মেতে থাকতেন এবং তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ট বন্ধু' । ফিটজেরাল্ডের খৈয়াম অনুবাদের অনুসরনে বাংলায় প্রায় ত্রিশটি রুবাই অনুবাদ করেন রবীন্দ্রবন্ধু প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) । রবীন্দ্রনাথ তখন খৈয়ামে আকৃষ্ট এবং রুবাই ঢং এর হালকা লঘু কাব্য রচনা করেন, তার

ভেতর 'ক্ষণিকা' এবং 'কণিকা' উল্লেখযোগ্য । ক্ষণিকা কাব্যের ভাবাদর্শ অনেকটা খৈয়ামাপ্লুত । এরপর ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) আন্তর্জাতিক বলয় থেকে কাব্য সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় তা অনুবাদ শুরু করেন । তাঁর তীর্থসলিল কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতার সংগে খৈয়ামের ১২টি রুবাইয়াত রাখেন । তিনি হাফিজেরও কয়েকটি গজলের সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন । এমনকি কবি মোহিত লাল মজুমদার, হাফিজের 'আগার আঁ-তুর্কে শীরাযী' নামীয় গযলের সরস অনুবাদ করেন । হাফিজের অনুবাদ করেছেন যতীন্দ্রনাথ বাগচিও । প্রমথ চৌধুরী খৈয়াম অনুবাদ না করলেও বিষয়বস্তু নিয়ে সনেট রচনা করেছেন, যেমন জীবনে কদিন আসে বসন্তের ঋতু। এরপর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ ওমর অনুবাদ করেন ১৯১৪-১৯১৬ সালের মধ্যে।[৪]

৩. দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত সুফী কবি পারস্যের ওমর খৈয়াম এর 'রুবাইয়া' এর বঙ্গানুবাদ করে সমসাময়িক সময়ে এ বিষয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ এবং নরেন্দ্র দেব । অনুবাদ মূল থেকে নয় বরং তাঁরা ফিটজেরাল্ডের (১৮৩৯-১৮৮৩খ্রী.) ইংরেজী অনুবাদকেই মডেল হিসেবে নিয়েছিলেন। কান্তিচন্দ্র তাঁর অনুবাদে ফিটজেরাল্ডের উপরে বিশ্বস্ত ছিলেন, আর এদিক দিয়ে নরেন্দ্র দেব ছিলেন অনেকটা স্বাধীন-মুক্ত। তাঁদের এ অনুবাদ বিগত শতাব্দীর বিশ বা ত্রিশ দশকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়া হতো।

৪. ১৮৭১ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহনকারী প্রতিভাধর কবি অতুল প্রসাদ সেন বাংলার সংগীত ভান্ডারের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনে অসামান্য অবদান রাখেন । বাল্যকালেই তার কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে, আর ব্রাহ্মসমাজের সংগীতোপসনাতেই তাঁর সাংগীতিক শিক্ষার সূচনা হয় । ১৮৯৪ সালে লন্ডন থেকে 'বার অ্যাট ল' করে ফিরে কার্যপোলক্ষ্যে লখনৌয়ে স্থায়ী হন। এ শহর তখন হিন্দুস্তানী সংগীত ও গজলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞগন প্রায়ই লখনৌতে জমায়েত হতেন । তিনি গুনি প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞদের গান বাজনা শোনার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং এই সান্নিধ্য ও সাহচার্য অতুল প্রসাদের সাংগীতিক চেতনা ও বোধ, ভাবনার তীক্ষ্ণতা পায়।

৫. ঠুংরী ও গজল সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি মুশায়েরায় উপস্থিত থেকে কবিদের স্বকণ্ঠে গজল শুনতে ভালবাসতেন। 'উত্তরা' পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ (১৩৩০) প্রথম সংখ্যায় তিনি মুসায়েরা নামে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন।[৫] লখনৌ তখন ঠুংরী সঙ্গীতের জন্য বিশেষ সুপরিচিত ছিল। ঠুংরী সঙ্গীতের আবহাওয়াতেই তাঁর নমনীয়তা ও ব্যথাতুর আবেগপ্রবনতা অতুলপ্রসাদকে তাড়িত করে । উর্দুতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন । ফলে ঠুংরী, গজলের মর্মে প্রবেশ করা তাঁর জন্য সহজ হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে তাঁর গানে সুরের চমক ও ঝলকানি সৃষ্টির পরিবর্তে হৃদয়ের সকরুণ ভাবোল্লাস, সুগভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পায়। এছাড়া তাঁর গানের কাব্যিক মহিমা ভাবের গভীরতা ও অনুভূতির আবেগ ও দরময়তার জন্য অতুলপ্রসাদের সংগীত সৃষ্টিতে এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা চলে।[৬] অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে তাই আমরা পাই গজল আঙ্গিকের গান। তাঁকেই বলা যায় বাংলা

ভাষায় গজল রচনার প্রথম পথিকৃৎ। 'কতো গান তো হলো গাওয়া' তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল।

এছাড়াও অতুল প্রসাদের অধিকাংশ গানই কাকলী, গীতগুঞ্জ নামের কাব্যগ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে অতুল প্রসাদ তার গানগুলি স্বরলিপিতে প্রকাশ করেন।

'কেগো তুমি বিরহিনী, আমারে সম্ভাষিলে/ এ পোড়া পরান তরে এত ভালবাসিলে' বা,'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' বা, 'বলো গো সজনী কেমনে ভুলিগো তোমায়', 'রাতারাতি করল কেরে ভরা বাগান ফাঁকা/ রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙ্গিনাতে আঁকা', 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে/ বলে দিল কে পথ এ কালো রাতে', 'জল বলে, চল মোর সাথে চল, কখনো তোর আঁখিজল হবেনা বিফল' কিংবা 'তুমি মধুর অঙ্গে সুর তরঙ্গে' ইত্যাদি ।

৬. আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অতুলপ্রসাদের দুই/তিনটি গানের লিরিক দেখে নিতে পারি। প্রথমটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গজল, কৃষ্ণ চট্টপাধ্যায়ের গাওয়া

কত গানতো হলো গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়া
যদি দেখা নাহি দিবে তবে মিছে কেন চাওয়া

যদি যতই মরি ঘুরে তুমি তত রবে দূরে
তবে কেন বাঁশী সুরে তব তরে শুধু ধাওয়া

যদি আমার দিবা-রাতি কাটি যাবে বিনা সাথী
তবে কেন বঁধুর লাগি পথ পানে শুধু চাওয়া

বড় ব্যাথা তোমায় চাওয়া আরও ব্যাথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথি না আসিবে এত ব্যথা কেন পাওয়া

আরেকটি গানের লিরিক এরকমঃ

বলো গো সজনী কেমনে ভুলিগো তোমায়
যতন যাতনা বাড়ায়
যদিও যাতনা সহি নয়ন ফিরায়ে লহি
গান তব পড়ে থাকে পায়, যতন যাতনা বাড়ায়
না-জানি কি আছে মধু তোমারো পরাণে বঁধু
প্রান সদা তোমা পানে ধায়, যতন যাতনা বাড়ায়

মান্নাদের গাওয়া আরেকটি বিখ্যাত গান হচ্ছে:

বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে।

আমিও একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে ।।
ডাকিছে দাদুরী মিলন তিয়াসে, ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে ।

পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে মধুর মিলনে সম্ভাষে ।
আমারো যে সাধ বয়ষার রাত কাটাই নাথের সাথে । গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী আছে চাহিয়া ।
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া, সজনী তোমার জাগিয়া ।
কোন অভিমানে হে নিঠুর নাথ, এখনও তোমারে ত্যাগিয়া?
এ জীবন-ভার হয়েছে অসহ, সঁপিব তোমার হাতে ।

৭. সন্দেহ নাই লিরিকগুলো অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং সবসময়ের জন্য আধুনিকও বটে । ট্র্যাডিশনাল গজলের অনুষঙ্গ স্পষ্টতই দৃশ্যমান । বিরহী প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের জন্য যন্ত্রণায় কাতর । প্রেমিকের স্মৃতিচারণ, মিলনাকাঙ্খা, একাকিত্বের যন্ত্রণা, পাওয়া না পাওয়া-এগুলোই এই গানগুলির মূল ভাব । গানগুলি মূলত: দুই চরণের স্তবকে তৈরী সাজানো মালা । অতুলপ্রসাদ মূলতঃ তাঁর গজলে বাংলা গীতিকাব্যের ফর্ম/কাঠামো ব্যবহার করেছেন । ফারসী/উর্দু আঙ্গিক গজলে যেখানে প্রতিটি স্তবক ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণ ভাবের প্রকাশ থাকে সেখানে তাঁর গজলে একটি ভাবেরই বিভিন্ন স্তবকে বিস্তৃতি দেখা যায় । তবে ভাব-ভাষাবিষয়বস্তু এবং সুরের রূপায়ণ গজলের বৈশিষ্ট ধারণ করে আছে । সুরগুলি সুমিষ্ট লাইট ক্ল্যাসিক্যালধর্মী । অতুল প্রসাদ নিজেও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন । ফলে তাঁর গানগুলি সত্যিকার অর্থে হৃদয়ছোঁয়া অনুভূতি প্রকাশ করে । এ প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী বলেন, ' গীতিবাহিত ভাবের সঙ্গে সুরের অর্থবহ সম্মেলনে তাঁর গীতকর্মের ভিত্তিভূমি গঠিত । বাংলা কাব্যসংগীতের এই অত্যুজ্জ্বল দিকটি ছিল অতুলপ্রসাদের মর্মগত । লখনৌ বাসকালে হিন্দুস্থানী গীতিরীতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে । তিনি বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরভঙ্গিমা প্রয়োগে উৎসাহী হয়ে ওঠেন । বিশেষ করে বাংলা কাব্যসংগীতের মূল মেজাজটি অক্ষুন্ন রেখে তাতে ঠুংরী ও গজলের ঢঙটি যুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন । [৭]

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা গজল ও নজরুলঃ

১. বাংলা কাব্যগীতিতে গজল একটি পৃথক ধারা হলেও এবং অতুলপ্রসাদ সেন তার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করলেও তার গজল গানের সংখ্যা অল্পতা এবং সুদুর লখনৌতে থাকার কারনে বাংলা গানের জগৎ বা শ্রোতৃমন্ডলের সংগে বিচ্ছিন্নতার কারনে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়নি ।

এসবদিক বিবেচনায় কাজী নজরুলকেই বাংলা কাব্য ইতিহাসে গজল যুগের প্রবর্তক হিসেবে

উল্লেখ করা যেতে পারে । বাংলা ভাষায় যে অসামান্য সৌন্দর্য-মন্ডিত গজল হতে পারে তা নজরুলের গজল শোনবার পরই সঙ্গীত পিপাসুগন অনুধাবনে সক্ষম হন । এ প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর 'নজরুলের গজলগান' শীর্ষক প্রবন্ধে (দৈনিক ইনকিলাব, ২০/০৮/২০০৮) উল্লেখ করেছেন,- 'নজরুল গজলগানের প্রবর্তক, শুধু প্রবর্তকই নন, শ্রেষ্ঠ । তাঁর আগে কি বাংলা গজলগান লেখা হয়েছে । লিখেছেন মুনশি মেহেরুল্লা, অতুলপ্রসাদ সেন, শেখ হবিবর রহমান (সাহিত্যরত্ন) প্রমুখ । কিন্তু বাংলা গানকে এমন-একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছেন নজরুল, শিখরে নিয়ে গেছেন, যা একমাত্র নজরুলের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে । তাঁর প্রভাবে সেকালে গজলগানও রচিত হয়েছে । এস. ওয়াজেদ আলির মতো অসামান্য প্রাবন্ধিকও লিখেছেন, আরো কেউ কেউ । তবে গজলগানের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যটি ছিল নজরুলের আয়ত্ত' ।

২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে করাচি থেকে ফিরে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন নজরুল । এরপর কৃষ্ণনগরে কবিপুত্র বুলবুলের জন্ম হয় ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে । এর আগে ১৯২১ সালে মোসলেম ভারতে যুগান্তকারী কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর কবিতা-গান অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে । দেশাত্মবোধক সংগীত, বিদ্রোহের বীররসে সিঞ্চিত এবং উদ্দীপ্ত পাঠক-শ্রোতা ।

কিন্তু বুলবুলের জন্মের পর থেকেই নজরুল বীররসের স্থলে চর্চ্চা শুরু করেন কোমল রসের । এসময়টায় লেখা হতে থাকে গজল । নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম তার 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন' গ্রন্থে যেমন উল্লেখ করেছেন-'১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে নজরুল ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও বুলবুলের জন্মের পর থেকে এক নব সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে ওঠেন । তিনি তার পুত্রের নাম দেন বুলবুল আর নিজেও সঙ্গে সঙ্গে গানের বুলবুল হয়ে ওঠেন, তাঁর শিল্পী জীবনের মধুরতম সৃষ্টি গজল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন । .....মনে হয় নজরুলের নবজাতক সন্তান নজরুলের জীবন বাগিচায় গানের বুলবুল রূপেই এসেছিল আর তাই গজলে সৃষ্টির স্রোত নেমেছিল' । তবে নজরুলের ওমর খৈয়াম কিংবা হাফিজে আসক্তি কিন্তু অনেক আগে থেকেই । কাজী নজরুল রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের অনুবাদের মুখবন্ধে তিনি লিখছেন,

'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি । সে ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা । সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয় । আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন । একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান । শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি-ভাষা শিখতে আরম্ভ করি । তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি' ।

ফার্সিতে এই ডুবে যাওয়া থেকে তার এসব অনুবাদ আগ্রহ এবং তারও পরে পারস্যের ঐ ধারা তাঁর শক্তিশালী লেখনী ও সঙ্গীতভাবনায় ক্রমাগত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং বাংলা

সংগীতাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে থাকে । ঐ মুখবন্ধে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও লেখেন,

'তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয় । কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি । এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি । অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়-গজল । বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল । ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্য্যে কুলোল না, এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল' ।

'ইতি হয়ে গেল' বললেও আসলে তা 'শেষ হয়নি' । ইতিকথার পরের কথা হচ্ছে, নজরুল হাফিজের রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন, ওমর খৈয়ম অনুবাদ করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন বাংলা কাব্যগীতিতে একটি নতুন ধারা তা হলো বাংলা গজল ।

যে বুলবুলের জন্মের পর তার মধুর রসচর্চা, সে বুলবুলের মৃত্যুর সংগেও রুবাইয়াৎ-ই হাফিজের অনুবাদের ইতিহাস জড়িত । নজরুল লিখছেন,

'যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুলবুল চ'লে গেছে । আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিলো শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম । বাঙলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন । আমার আহবান উপেক্ষিত হয়নি । যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাজা' (শব-যান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন । আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হলো' । এমনকি ইরানের প্রাচীন কবি রুদকীর প্রতিও আগ্রহী ছিলেন নজরুল । অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতিচারনে বলেন, 'কবি কাজী নজরুল ইসলামই সর্বপ্রথম কবি রুদকীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তাঁহার আগ্রহেই কবি রুদকী প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার হাতে দেই, কেন না তিনি রুদকীর ফার্সি কবিতাগুলি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন' । [৮]

৩. কাজী নজরুল তাঁর অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভায় পারস্যের এই কাব্যগীতিধারা বাংলায় ঠাঁই করে দিলেন চিরস্থায়ীভাবে । বাংলা গজলসমূহ তাঁর প্রতিভাদীপ্তি স্ফুরণে নতুন মাত্রায় বাংলা কাব্যগীতিতে পৃথক ধারায় প্রতিষ্ঠিত হলো । গজলের সত্যিকার আমেজ পাওয়া গেল নজরুলের সৃষ্টিতে ।

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় ২৯ শে জুন ১৯৭৪ সংখ্যায় 'কল্লোলের কাল ' শীর্ষক পত্রে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই, ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' গজলটির রচনা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখছেন,

'তখন সপরিবারে কাজী সাহেব থাকেন কেষ্টনগরে । তাঁর আর্থিক অবস্থা এসময়ে সচ্ছল ছিলনা । একদিন বিকালে তিনি ঝড়ের বেগে, কল্লোল অফিসে ঢুকেই বললেন 'শিগগির গোটা কয়েক টাকা যোগাড় করে দে । হাঁড়ি আজ শিকে থেকে নামেনি । তোরা যদি টাকা

যোগাড় করে দিতে পারিস তা হলে নামবে । আমাকে এক্ষুনি কেষ্টনগরে ফিরে যেতে হবে। দেরী করলে চলবে না' । টাকার যোগাড় হলো । কাজী সাহেব চলে গেলেন । কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে ফিরে এলেন কাজী সাহেব । হাতে তাঁর একখানি কাগজ । নৃপেন বাবুর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'ট্রেনে আসতে আসতে লিখে ফেলেছি । দেখিস যদি চলে তো চালিয়ে দিস' ।

কাগজখানি হ্যান্ড বিল । তার উল্টোপিঠে কাঁপা কাঁপা পেনসিলের লেখা । বুঝতে কষ্ট হয়না যে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে লেখাগুলি কেঁপে গেছে । পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল এটি কাজী সাহেবের সেই বিখ্যাত গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' ।

'নজরুল স্মৃতি-১৯৭০ সাহিত্যম- এ নলিনীকান্ত জানাচ্ছেন যে একজন পুরুষ ও একজন নারী হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী হারমোনিয়াম সহযোগে উর্দু গজল গেয়ে পথে পথে চলার সময় তাদেরকে ডেকে বৈঠকখানায় বসে অনেকগুলি গান শুনলেন তাদের কাছ থেকে । তাদের গাওয়া 'জাগো পিয়া' গানটির রেশ তখনো নজরুলের হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে । নজরুল তখনি গান লিখতে বসে কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পরান পিয়া' গানটি । 'যুগগ্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন বলছেন যে কলকাতা অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধ মিসরীয় নৃত্যশিল্পী ফরিদার কণ্ঠে 'কিসকি খায়রো ম্যায় নাজনে, কবরো মেঁ দিল হিলা দিয়া চ্যায়েন সে সো রাহাথা ম্যায়, কিসনে মুঝে জাগা দিয়া' উর্দু গজলটি শুনে তারই সুরে 'আসে বসন্ত ফুল বনে' গজলটি রচিত ।

নলিনীকান্ত বলেছেন 'তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে । গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসলো । অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্য কয়েকজন উগ্রপন্থী ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করেছিলেন যথেষ্ট । রসের সন্ধান পেলে কবি প্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাঁধাই তৃণখন্ডের মতো ভেসে যায় । এক্ষেত্রেও তাই হলো' । ব্যঙ্গ বিদ্রুপ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলছেন নজরুলের গজল গানকে 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠি নাম দিয়েছিল 'নজরুলিয়া গজল' । 'তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গজল গানের প্যারডিও করেছিল' ।

বুদ্ধদেব বসু জানাচ্ছেন, 'সে বারে ঢাকায় যে সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত 'প্রগতি' তে বেরিয়েছিল । 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিবে',' নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ পিয়া'-এসব গান ঢাকায় লিখেছিলেন বলে মনে পড়ছে । এইমাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে শুনতে আমাদের মনের মধ্যেও নেশা ধরে যেতো' ।

৪. নজরুলের অনেক লেখা ও সুরারোপিত গান নিয়ে লেখক ভেদে তথ্যগত অমিল পাওয়া যায় এবং গবেষকদের মধ্যে স্থান, তারিখ, ক্ষণ নিয়ে প্রায়শই সাংঘর্ষিক অবস্থান লক্ষ্যণীয় হলেও, এ বিষয়ে বিস্তারিত যাওয়ার কোন অভিপ্রায় নেই বিধায় সে দিকে না যেয়ে তাঁর বিখ্যাত গজলগুলি আমরা দেখে নিতে পারি ।

১ । ভূলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা

২। কে বিদেশি মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে
৩। বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরনে চল লো গৌরী
৪। কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি
৫। কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি
৬। পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরান প্রিয়
৭। নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল
৮। পাষানের ভাঙ্গালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়
৯। মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম
১০। চেয়ো না সুনয়না আর চেয়োনা এই নয়ন পানে
১১। এত জল ও কাজল চোখে পাষানী আনলে বল কে
১২। যাও যাও তুমি ফিরে
১৩। ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়
১৪। রেশমি চুড়ীর শিনি্জনীতে
১৫। বউ কথা কও
১৬। এ আঁখিজল মোছ পিয়া
১৭। ঐ ঘর-ভুলানো সুরে
১৮। একি সুরে তুমি গান শুনালে ভিনদেশী পাখী
১৯। শূণ্য আজি গুলবাগিচা যায় কেঁদে দখিণ হাওয়া
২০। তোমার আঁখির কসম সাকী চাহি না মদ আঙুর পেষা
২১। গোলাব ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়
২২। এলো ফুলের মরশুম শরাব ঢাল সাকী
২৩। আনো সাকী শিরাজী আনো আঁখি পিয়ালায়
২৪। আলগা করো গো খোপার বাঁধন
২৫। পানসে জোছনাতে কে চল গো পানসী বেয়ে
২৬। কোন বন হতে করেছ চুরি হরিণ আঁখি
২৭। দিতে এলে ফুল হে প্রিয়
২৮। প্রিয় যাই যাই বলোনা
২৯। গুল বাগিচায় বুলবুলি আমি রঙীণ প্রেমের গাই গজল
৩০। চোখের নেশার ভালোবাসা সে কি কভু থাকে গো
৩১। পলাশ ফুলের গেলাশ ভরি
৩২। আধো আধো বোল
৩৩। বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে
৩৪। আন গোলাপ পানি, আন আতরদানি গুলবাগে
৩৫। করুণ কেন অরুন আঁখি দাওগো সাকি দাও শারাব

৩৬। তরুণ প্রেমিক প্রিয় বেদন জানাও জানাও বে-দিল প্রিয়ার
৩৭। আসল যখন ফুলের ফাগুন গুলবাগে ফুল চায় বিদায়
৩৮। আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কেগো দরদী
৩৯। আসে বসন্ত ফুল বনে
৪০। নিশি ভোর হলো জাগিয়া
৪১। কেন আন ফুলভোর আজি বিদায় বেলা
৪২। কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া
৪৩। মুসাফির মোছরে আঁখি জল
৪৪। এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল
৪৫। রুমুঝুম রুমঝুমু কে এলে নুপুর পায়
৪৬। ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী
৪৭। আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়
৪৮। তোমার বুকের ফুলদানীতে ফুল হব বঁধু আমি
৪৯। দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিনী
৫০। গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে

৫. আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, নজরুলের গজল মূলত প্রেমপ্রাসঙ্গিক। কিছু ইসলামী গজলও আছে । তিনি গজলগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেনঃ ১। পার্থিব প্রেমের ২। অপার্থিব প্রেমের

পার্থিব প্রেমের গজলের তালিকায় রেখেছেন,

১। বাগিচায় বুলবুলি তুই ২। ভুলি কেমনে আজো যে মনে ৩। কেন আসিলে ভালোবাসিলে দিবেনা ধরা ৪। গুলবাগিচার বুলবুলি আমি রঙিন প্রেমের গাই গজল ৫। চেয়োনা সুনয়না ৬। পথ চলিতে যদি চকিতে ৭।বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে ।

আর অপার্থিব প্রেমের গজলের তালিকায় রেখেছেন:

১। খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে
২। তৌহিদের মুরশিদ আমার ইত্যাদি ।

৬. তিনি নজরুলের পরীক্ষামূলক গজলের নমুনা দিয়েছেনঃ (বাংলা+উর্দু) ।

আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফাস গ্যায়ি
বিনোদবেনীর জরিন ফিতায়
আন্ধা ইশ্‌ক মেরা কাস্? গ্যায়ি ।
(বাংলা+হিন্দি)
যৌবনের বনে মোর, কোয়েলা মাত্? মাচাও শোর

বিরহ দাহনে জ্বলে মরি/তুভি মোর সাথ্না ছোড় ।।

নজরুলের গজল-গুলিকে আবার কেউ কেউ বৃহত্তর আঙ্গিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে থাকেন । প্রথমভাগে নজরুলের ফার্সী গজলের অনুবাদসমূহ এবং ফার্সী গজলের বিষয় ও অনুষঙ্গ ব্যবহার করে রচিত গজলগুলি । আর দ্বিতীয় ভাগে রাখা যেতে পারে এদেশের জীবন, প্রকৃতি, প্রেম বিষয় কেন্দ্রিক ।

৭. নজরুল যে একশতটির মত গজল রচনা করেছিলেন তার বিষয়বস্তু, অনুষঙ্গ ও আঙ্গিক বিবেচনায় গজলগুলিতে চারটি ধারা প্রবহমান দেখা যায়:

ক. ফারসী গজলের অনুবাদ
খ. ফারসী গজলের প্রভাবে রচিত গজল
গ. ইসলামী ভাবধারায় রচিত ইসলামী গজল
ঘ. বাংলা গজল ।

ক. ফারসী গজলের অনুবাদ:

খৈয়াম, হাফিজের চিরঅনুরাগী নজরুল যেমন তাঁদের রুবাই অনুবাদ করেন তেমনি তার অনেকগুলি গজল আঙ্গিকে রচনা করেন ।

যেমন: খৈয়ামের অনুবাদসমূহের মধ্যে আছে :

১ । পিও, শরাব পিও তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে
২ । তরুন প্রেমিক প্রণয়বেদন জাগাও জাগাও বেদিল প্রিয়ায়
৩ । হে অবোধ । শূণ্য শুধু শূণ্যধূলো মাটির ধরা
৪ । যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি প্রিয়
৫ । আজ বাদে কাল আসবে কিনা কে জানে ।

কিংবা, হাফিজের অনুবাদ:

১ । আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা
২ । মোর পাত্র মদ্য রোশনায়ে ক? রৌশন এয়? সাকী
৩ । হাঁ, এয়? সাকী শারাব ভর লাও বোলাও পেয়ালী চালাও হরদম
৪ । জাগো সাকী হামদরদী, জামবাটিতে দাও শারাব
৫ । বুক-ব্যথানো বেনুর বেদন বাজিয়েছিল কাল রাতে ইত্যাদি

এ গজলগুলি পারস্য কবিদের অনুবাদ হলেও নজরুলের নিজস্বতা কিন্তু দৃশ্যমান । আরো অনেকের মত তিনি কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ করেননি বরং করেছেন ভাবানুবাদ । এতে পারস্যের মরমীদর্শন, শিল্পসংস্কৃতির অনুরণন থাকলেও গজল রচনায় এবং সুরে বাংলাগানের কাঠামো বজায় রেখেছেন । গজলে স্থায়ী ও অন্তরা এনেছেন । আবার এর সংগে নতুনত্ব যেটি যোগ করেছেন তা হচ্ছে গজল আবৃত্তির 'তারান্নুম' ঢঙ্গে এসব ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করেছেন তালহীন সুরের উপর আবৃত্তির ঢং। নজরুল যাকে বলেছেন 'শেয়র'-এটি তালহীন, বিলম্বিত লয়ে আবৃত্তির ঢঙ্গে উচ্চারণ । এই অংশটুকু আবার কিছু ক্ষেত্রে 'সঞ্চারী' হিসেবে ব্যবহার করেছেন । আবার কিছু গজলে 'শেয়র' সংযুক্ত না করে সরাসরি 'সঞ্চারী' যোগ করেছেন অত্যন্ত মেলোডিয়াস সুরে । শেয়রগুলি আবার দর্শনের ভাবে চিরন্তন প্রজ্ঞা উসকে দিয়ে পাঠক-শ্রোতাদের মোহিত করে ।

খ. ফারসী গজলের প্রভাবে রচিত গজল:

পারস্যের সাহিত্য-দর্শনের চির জিজ্ঞাসা, জীবনবোধ, সাংস্কৃতিক ভাবনা নজরুলকে প্রভাবিত করে । যেসকল চিন্তা-মনন, আবেগ, পারস্য প্রকাশভঙ্গি এবং অনুষঙ্গ যেমন গুল, গুলবাগ, বুলবুল, শারাব-সাকী, নার্গিস ইত্যাদির ব্যবহার করে অনেক গজল রচনা করেন যেমন:

১। বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাগাতে দিসনে আজি দোল্? (ভৈরবী-কাহারবা)
২। একি সুরে তুমি গান শোনালে (মিশ্র ভৈরবী-দাদরা)
৩। নিশি ভোর হলো জাগিয়া (ভৈরবী-কাহারবা)
৪। বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ ফুটল কি বকুল (পাহাড়ী-কানাড়া মিশ্ররুপক)
৫। আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী (জৌনপুরী-আশাবরী-কাহারবা)
কিংবা
৬। কে বিদেশি মন উদাসী (খাম্বাজ-গারামিশ্র-কাহারবা)

গ. ইসলাম ভাবধারায় রচিত ইসলামী গজল

কাজী নজরুল ইসলামের বাল্য ও শৈশবকাল পর্যবেক্ষনে আমরা দেখি চুরুলিয়ায় তার বসবাসের গ্রামের পূর্বদিকে রাজা নরোত্তম সিংহের গড়, দক্ষিনে পীরপুকুর, এবং সেখানে সাধক হাজী পাহলোয়ানের মাজারশরীফ, কাছেই মসজিদ । এ মসজিদের মক্তবে তিনি পড়েছেন, শিক্ষকতা করেছেন, মুয়াজ্জিন, ইমামের দায়িত্ব পালন করেছেন । মাজারের খিদমতগারির কল্যাণে সুফী আধ্যাত্মবাদ তাঁর অন্তরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আবার যৌবনে নজরুলকে দেখেছি প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। আবার দেখেছি এ বিদ্রোহের আড়ালে স্বদেশ প্রেম । আর দেখেছি নিরন্তর প্রেমের ফল্গুধারা তাঁর অন্তরে বয়ে চলতে । এ নজরুল আত্মভোলা, বেহিসেবী, চিরপ্রেমিক নজরুল । চির বিরহী নজরুল । নজরুলের অন্তরে বয়ে চলা নদীটির সকল কিছুই পারস্য গজলের প্রয়োজনীয় উপাদান ।

নজরুলের অসংখ্য হামদ, নাত এর পাশাপাশি ইসলামী গজল তাই অতি বিখ্যাত । যেমন:

হামদ: ১। আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়
২। আমি আল্লাহ্ নামের বীজ বুনেছি

৩। এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
৪। খোদা এই গরীবের শোনো শোনো মোনাজাত

নাত: ৫। তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে

৬। মোহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে
৭। মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
৮। ইয়া মোহাম্মদ বেহেস্ত হতে
৯। নাম মোহাম্মদ বোলরে মন
১০। এ কোন মধুর সরাব দিলে আল আরাবি সাকি
১১। সাহারাতে ফুটলরে ফুল রঙীন গুলে লালা

অন্যান্য গজল:

১২। ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
১৩। দে জাকাত দে
১৪। ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
১৫। মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
১৬। রোজ হাশরে আল্লাহ আমার কর না বিচার ইত্যাদি

ঘ. বাংলা গজল:

এ গজলগুলো পারস্য ভাবধারার প্রভাবমুক্ত হয়ে রচিত । এ গজলগুলিতে নজরুলের প্রেমিক হৃদয়ের অনুভব ফুঁটে উঠেছে । প্রেমিক মন, প্রেমের আকাঙ্খা-আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, আবেগ-অনুরাগ-এগুলোই এ গজলের উপজীব্য । যেমন:

১। এত জল ও কাজল চোখে পাষানী
২। উচাটন মন ঘরে রয়না
৩। আধো আধো বোল
৪। নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল
৫। আমার কোন কুলে আজ ভিড়ল তরী এ কোন সোনারগাঁয়
৬। ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা
৭। কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে
৮। বউ কথা কও বউ কথা কও
৯। তোমার বুকের ফুলদানীতে ফুল হব বঁধু আমি
১০। ঐ ঘর ভুলানো সুরে
১১। প্রিয় এমন রাত যেন যায়না বৃথায় ইত্যাদি ।

৮. ১৩৩৩ সালের হেমন্ত কাল (১৯২৬খ্রী.) থেকে গজল রচনায় ব্রতী হন নজরুল । সাতাশ বছর বয়সী নজরুল এসময় শুরু করলেন আরেক সঙ্গীত বিস্ময় গজল । কৃষ্ণনগরে

থাকাকালে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্মের সময়টিতে কবি নিদারুণ অর্থ কষ্টে নিপতিত হন । অথচ সেসময়ের বিপরীত স্রোতধারায় বীররসের কবি ব্রতী হলেন কোমল মধুর রসের গজল রচনায় । সাহিত্যামুদে বাঙালী এ নবরসের ধারায় শুধু সিক্তিত নয় বরং অবগাহনে চমৎকৃত হতে থাকলো । প্রকাশিত হতে থাকে কল্লোল, বঙ্গবানী, নওরোজ, সওগাত প্রভৃতিতে ।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত গীতগ্রন্থ 'বুলবুল' নজরুলের গজল সংকলনরূপে বিখ্যাত । এছাড়াও চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুলগীতিকা (১৯৩০), সুরসাকী (১৯৩১), বনগীতি (১৯৩২), গুল বাগিচা (১৯৩৩), গীতিশতদল (১৯৩৪), গানেরমালা (১৯৩৪), প্রভৃতি গীত সংকলনে বেশ কিছু গজল অন্তর্ভূক্ত হয় । 'বুলবুল' এর দ্বিতীয় খন্ডও প্রকাশিত হয় ।

১৯২৬ এর শেষ দিক থেকে গজল লেখা শুরু করলেও এ বিষয়ে নজরুল অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আরো আগে থেকেই । 'রুবাইয়্যাৎ-ই- হাফিজ' এর অনুবাদ এর শেষে সংযোজিত 'মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে' হাফিজের গজল প্রসঙ্গে নজরুল বলেন, 'হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত । কুলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মনিমুক্তার সন্ধান পায় । তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা, নিম্নে তেমনি অতলগভীর প্রশান্তি, মহিমা । .....আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরণীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরণী নাচিয়া নাচিয়া শূণ্যে ঘুরিয়া ফেরে । তারকারা মণিমানিক্য খচিত আকাশ পেয়ালার সাকীকে কবি ডাকে, শারাব ভিক্ষা করে আর গান গায় 'বদেহ সাকী ময়ে বাকী' ওগো সাকী আরো- আরো শারাব ঢাল । কিছুই বাকী রাখিও না । পাত্র উজাড় করিয়া শারাব ঢাল' ।

হাফিজের গজল অনুবাদ আরও কিছু আগে শুরু করেছিলেন । দীওয়ান-ই-হাফিজ এর অন্তর্ভূক্ত অনুবাদকৃত গজল 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল ।

৯. আরব ঐতিহ্যের গজলের ধারা পারস্যে গতিপ্রাপ্ত হয় স্থানীয় ধারাসমূহের সংগে মিশে-তা প্রমত্ততা পায় বিশ্ববিশ্রুত মরমী মহাকবিদের অবদানে । আর মুসলিম শাসনের বাতাবরনে পারস্য সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও উপমহাদেশীয় সঙ্গীত সংস্কৃতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় পারস্যের গজল নতুন অবয়বে দেখা দেয় এ অঞ্চলের উর্দু গজলে । হিন্দুস্তানী গুরু ও লঘু রাগ সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যের কাঠামোতে ফার্সি গজল ভিন্ন ভাষা গ্রহন করেও সঙ্গীত হিসেবে গজলকে নিয়ে যায় আরও উচ্চমাত্রায় । বিশেষ করে লঘু রাগ সঙ্গীতের মিহি অলংকরন ও পেলব বিস্তার গজলের ভাব-ভাবনা প্রকাশে অতিশয় পটুতা প্রদর্শন করে । উর্দু ভাষার অলংকারসমূহ গজলকে আরও ব্যঞ্জনা দেয়,- প্রকাশকে করে আরোও সমৃদ্ধ । আবার গানের মূল কাঠামো ঠিক রেখে যোগ্য গায়কের গায়কী যোগ করে গজলের ছোট ছোট কারুকার্য অর্থাৎ মুর্কীর কাজ, একস্বর থেকে অন্য স্বরে প্রলম্বিত মীড়ের কাজ, স্পর্শ স্বরের সুরেলা প্রয়োগ কিংবা মনখুলে লয়কারী দেখানো ঠুংরীর মত খেলতে জানা শিল্পীদের কণ্ঠে

গজল হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত-বানী, সুরের ভেলায় চড়ে মানুষকে পৌঁছে দেয় অনির্বচনীয়তার জগতে । নজরুলের গজলের জন্য এ যেনো এক মহাসত্য ।

১০. দৃপ্ত যৌবনের প্রকাশ যেমন সংগ্রামে-বিদ্রোহে, তেমনি প্রেম-প্রণয়ও যৌবনেরই ধর্ম । তাই দ্রোহের কবিতা আর ভাঙার গানের কবি প্রণয়সঙ্গীত গজলে তীব্রভাবে প্রকাশিত হতে থাকেন বাংলা গজলের মাধ্যমে । কবির নিজ ভাষায় 'কোলাহল অনেক করেছি, এইবার গানে গানে প্রাণের আলাপন' । এই গানে গানে প্রাণের আলাপচারিতায় বিমুগ্ধ হয়ে থাকে বাঙালী শ্রোতৃসমাজ ।

গজল আরবী-ফারসী-তুর্কী-উর্দূ ইত্যাদি ভাষা থেকে অনুসৃত হলেও বাংলা গজলকে নবরূপ দান করলেন নজরুল । তাঁর নিপুন হাতের ছোঁয়ায় কাব্যগীতির এই ধারা ও সৌন্দর্য্য বাঙ্গালী সঙ্গীত শিল্পীদের চিত্ত তাৎক্ষনিকভাবে জয় করতে সমর্থ হয় । দিলীপকুমার রায়, নলিনী কান্ত সরকার, সাহানা দেবী প্রমুখ বরেন্য গায়ক-গায়িকা নজরুলের গজল গাইতে থাকেন যা সংগীতমহলে বিস্ময়ভরা আনন্দ নিয়ে উপস্থিত হয় । বিশেষকরে ডিএল রায়ের পুত্র এবং বিখ্যাত লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা ও-গায়ক দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে নজরুলের গজল সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করে ও সমাদৃত হয় ।

দিলীপ রায় লিখছেন, 'গানে ওর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল সবচেয়ে বেশী ওর বাংলা গজলেই বলব । আমার বিশেষ প্রিয় ছিল ওর একটি গজল যেটি ভ্রাম্যমান হয়ে সর্বত্র গেয়ে আমি বহু শ্রোতাকেই সচকিত করে তুলেছিলাম: বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল... এই গানটির জন্যই ও আমাকে পরে ওর গজল গীতিগুচ্ছ 'বুলবুল' উৎসর্গ করে । ওর আর একটি গান আমি গাইতাম-আমার গানের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনকে শিখিয়েও ছিলাম: আমায় চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী । ওর আর একটি মনোজ্ঞ গজল: চেওনা আর চেওনা সুনয়না, এ নয়ন পানে' ।[৯] দূভার্গ্য যে এসকল কোন গান দিলীপ রায় রেকর্ড করেননি ।

অন্যত্র দিলীপ লিখছেন, 'একসময় আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা-বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরনে চল লো গোরী, এতজল ও কাজল চোখে, কেন কাঁদে পরান কি বেদনায় কারে কহি, চেওনা আর চেওনা সুনয়না এ নয়ন পানে, কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে, কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে, সখি বলো বধূয়ারে নিরজনে, নিশি ভোর হল জাগিয়া পরান পিয়া, আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী, করুণ কেন অরুন আঁখি, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু প্রভৃতি । এগুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল সে খাতাটি আজো আমার আছে' ।[১০]

নারায়ণ চৌধুরী 'বাঙালীর গীতচর্চা' গ্রন্থে উল্লেখ করছেন, তিনি (দিলীপকুমার রায়) কাজী নজরুলের গজল গানগুলির কণ্ঠরূপায়নে ও প্রচারে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেন। বাগিচায় বুলবুলি তুই, আমার চোখ ইশারায় প্রভৃতি নজরুল রচিত গজল তাঁর মুখে শুনেই

বাঙালী প্রথম গজল গানের প্রতি আকৃষ্ট হন'। [১১]

১১. গজল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই চরণে নির্মিত স্তবকক্রমে লিখিত হয় । দিলীপ কুমার রায় যাকে বলেছেন 'শ্লোকে শ্লোকে জোড় পায়ে এগিয়ে চলা- দু'টি করে চরণে একটি করে মূল ভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলা'। এই স্তবক বা শের সমূহ একেকটি একেক ভাবের এবং তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। গাইবার সময়তেও একেকটি কাব্যকণিকার আস্বাদ পাওয়া যায়-ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঞ্জনে পরিপূর্ণ খাওয়ার তৃপ্তি । আবু সয়ীদ আইয়ুব এর মতে ' পাঁচ-সাতটি বা পনেরো-কুড়িটি শের এর সমষ্টি, কেবলমাত্র ছন্দ ও মিলের ঐক্যে একত্রিত'।

নজরুলের অধিকাংশ গজল দ্বিচরণস্তবকে রচিত । এর স্তবক বিণ্যাস (শের) পারসিয়ান ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী পৃথক বক্তব্য বা বর্ণনায় গঠিত । এটি পৃথকভাবে পাঠ করলেও রসাস্বাদনে ব্যতয় হয়না । সব দ্বিপদ স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও অংশত সম্পূর্ণ ।

দ্বিচরণ স্তবকের রচনার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে:
১। ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা,
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি সকলি ফাঁকা
২। বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্?নে আজি দোল,
আজো তা'র ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল।
৩। কেউ ভোলেনা কেউ-ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি,
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে, কেউ ভুলিতে গায় গীতি।
৪। বউ কথা কও, বউ কথা কও, কও কথা অভিমানিনী,
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী।
কিংবা
৫। আমার কোন্? কুলে আজ ভিড়ল তরী এ কোন্? সোনারগাঁয়,
আমার ভাটির তরী আবার কেন উজান যেতে চায়।

এই দ্বিচরণের চল্? দেখতে পাই নজরুলের ওমর খৈয়ম-গীতি কিংবা দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতিতেও। যেমন:

১। পিও শরাব পিও- তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমির পুরে তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া রবেনা সাথে ।।
২। যেদিন ল'ব বিদায় ধরা ছাড়ি, প্রিয়ে।
ধুয়ো 'লাশ' আমার লাল পানি দিয়ে।।
৩। আরো নূতন নূতনতর শোনাওগীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা।।
৪। আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুল্?-বাগে ফুল চায় বিদায়।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায়।।

নজরুলের গজলে এই দ্বিচরণ স্তবকের তথা শের এর ব্যবহার ছাড়াও এর আরেকটি দিক লক্ষ্য করা যায় । তাঁর গজলের প্রথম স্তবক বা শেরকে স্থায়ী হিসেবে ব্যবহার করে পরবর্তী শেরগুলি অন্তরা হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি সুর সংযোগের ক্ষেত্রে কিছু শের এ গজলের নির্ধারিত সুর লয়ে না থেকে অনেকটা আবৃত্তির ঢঙ ব্যবহার করেছেন যাকে তারান্নুম বলা যেতে পারে । এসকল জায়গায় এই শেরগুলিকে নজরুল অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন 'শেয়র । সঙ্গীতজ্ঞ মোবারক হোসেন খান গজলের এই বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'গজল সাধারণত লয়ে গীত হয় । কিন্তু লয়ের কারসাজিতে শিল্পীর পরিবেশনার ওস্তাদী বেশ উপভোগ্য । গজলের প্রকৃতি অনেকটা আবৃত্তির মতো । মাঝেমধ্যে সেখানে ছন্দ ভেঙে একটানা দীর্ঘ স্বরে পদ আবৃত্তি করতে হয়, সে জায়গাগুলোকে বলা হয় শ্যের । এই শ্যের গজলের প্রধান বৈশিষ্ট্য' । [১২] নারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'বাঙালীর গীতচর্চা' গ্রন্থে বলেছেন, 'পারসিক গজলের ধাঁচে তিনিই প্রথম আবৃত্তিভঙ্গিম টানা লয়ের সুরে গেয় 'শ্যের' যুক্ত বাংলা প্রেমসংগীত রচনা করেন' । নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলছেন, 'নজরুলের গজলের আঙ্গিক প্রায় উর্দু গজলের মতোই, আগাগোড়া তালে প্রয়োগ নেই, কিছু অংশ তাল ছাড়া মুক্ত ছন্দে ও আলাপের রীতিতে, বাকী অংশ তালের কাঠামোতে' । [১৩]

১২. গজলের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে শের এর ব্যবহার ছাড়াও বেহের বিবেচনায় দেখা যায় যে এগুলি উৎকৃষ্ট মানের কবিতা হওয়ায় তার শেরের লাইনগুলির মিটার বা লেংন্থগুলি সাধারণভাবে সমমাত্রা সম্পন্ন । অন্তমিলে রাদিফ এর ব্যবহারও চমৎকার-প্রথম শেরের দু'টি লাইনেই এবং পরের শেরগুলির ২য় লাইনের অন্তমিল একইরূপ-তবে কাফিয়ার ব্যবহার কম করেছেন ।

নজরুল তাঁর গজলে ধ্রুপদী আরবী/ফারসী গজলের আদলে তাখাল্লুস ব্যবহার করেছেন । তাখাল্লুস বা ছদ্মনাম (Pen name) হিসেবে উল্লেখ করেছেন **'কবি'** নামটি । কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক:

১ । 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' গজলের মাকতায় (শেষ শের) উল্লেখ করেছেন
'কবি' তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে কুল পেলিনে আর
ফুলে তোর বুক ভরেছিস আজকে জলে ভ'রে আঁখির কোল ।।

২ ।'ভুলি কেমনে আজো যে মনে'তে ব্যবহার করেছেন,
ডালে তোর হানলে আঘাত দিসরে **'কবি'** ফুল সওগাত
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ।।

কিংবা ৩ । 'এত জল ও কাজল চোখে' তে উল্লেখ করেছেন,

বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিটল না **'কবি'**
ফটিক জল- জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে ।।

এভাবে 'মুসাফির মোছরে আঁখি জল' এ-রে 'কবি',কতই দেয়ালি জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি, 'কেন আন ফুল-ডোর' এ 'যদি আকাশ-কুসুম পেলি চকিতে 'কবি', 'নহে নহে প্রিয়' তে কেন 'কবি' খালি খালি হলিরে চোখের বালি'কিংবা 'করুণ কেন অরুণ আঁখিতে' দেখরে 'কবি' প্রিয়ার ছবি এ শারাবের আর্শিতে । আবার কোথাও নজরুল বলেছেন 'ভোমর 'কবি', পথিক 'কবি' ইত্যাদি । তাখাল্লুসের চমৎকার ব্যবহার নজরুলের গজলকে করেছে আরও মোহনীয়-আকর্ষনীয় ।

১৩. নজরুলের রচিত গজলগুলির বিশ্লেষণ আরেকভাবে করা যায় । আরব্য ভাষা সংস্কৃতিতে উদ্ভব হলেও এর বিকাশ মূলতঃ পারস্য দেশে । রুমি, হাফিজ, খৈয়ম প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মরমী ফার্সি কবিগন সংগীতের এই ধারার পথিকৃৎ। তাঁদের কাজের অসাধারণ গঠন, ভাব, ভাবনা ব্যাঞ্জনাসহ এই মরমী কবিরা তাদের গীতিকাব্যগুলিকে পারমার্থিক ভাবনার প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন । গুরু ভাবনাগুলি অবলীলায় প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাব্যে কবিতায় । মরমী কাব্য সমূহের বৈশিষ্ট হচ্ছে তার ঐচ্ছিক অর্থ দ্বৈততা, আপাত অর্থের অন্তরালে থাকে গুপ্ত গূঢ় সারার্থ । জাগতিক বিষয়ের অন্তরালে নিহিত থাকে লোকোত্তর জগতের দ্যোতনা । প্রত্যক্ষ জগতের ভাবনার ভেতরে থাকে অপ্রত্যক্ষ জগতের প্রকাশ । নজরুল তাঁর কিছু রচনায় ফার্সী গজলের এই রূপক ব্যবহার করেছেন । 'জাগো জাগোরে মুসাফির হয়ে আসে নিশি ভোর' কিংবা 'মুসাফির, মোছরে আঁখি জল' প্রভৃতি এ শ্রেণীর গজল ।

১৪. শব্দচয়নেও নজরুল ফারসী অনুষঙ্গ ও শব্দ ব্যবহার করেছেন । আসাদুল হক 'নজরুল যখন বেতারে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রাত ৮টায় প্রচারিত হয় গজল গীতি-বিচিত্রা 'গুলবাগিচা' । এই গীতি-বিচিত্রাটি নজরুলের হাতে লেখা সাত পাতার পুরো পান্ডুলিপি আমি দেখতে পাই শ্রদ্ধেয় ড. রফিকুল ইসলামের কাছে। এই গীতি-বিচিত্রাটি পরে ছাপা হয় নজরুল রচনাবলীতে । রচনা ও সুর-কাজী নজরুল ইসলাম। সঙ্গীত-যন্ত্রীসংঘ । গীত ভূমিকায়-এ.আই.আর. শিল্পীবৃন্দ"। গীতিবিচিত্রাটি এইরূপ:

"গুল-বাগিচায় নৌ-বাহারের মরসুম । যৌবনের এই গুল-বাগিচার বুলবুলি, গোলাপ, চম্পা, চামেলী, ভ্রমর, প্রজাপতি, নহর, লতাকুঞ্জ, শারাব, সাকি-চির-তাজা। এখানে চির বসন্ত বিরাজিত। সাকির হাতে শিরাজির পেয়ালা, কবির বুকে দিলরুবা, রবাব বেণু, আর গজল-গানের দীওয়ান। এই গুলিস্তানের কবি চির-তরুণ, চির-কিশোর। কবির অঙ্গে হেলান দিয়ে লীলায়িত-দেহ কবির মানসী প্রিয়া। ফিরোজা রং-এর ওড়না, গোধূলি রঙের পেশোয়াজ-পরা সুর্মামাখা ডাগর চোখে তার বিকশিত প্রেমের নিলাজ আকুতি। এই শীর্ণা তন্বী কবি-প্রিয়ার হাতে মৌন বীণা, অধরে অভিমান, পায়ের কাছে পড়ে গোলাপ-কুঁড়ির গুচ্ছ। চঞ্চল কবিকে তার বিশ্বাস নেই, কোনো প্রেমের বন্ধনে যেন এই

চঞ্চলকে বাঁধা যায় না। এই আনন্দ-বিলাসী প্রজাপতিটাকে সে তার কিঙ্খাবের বক্ষ-আস্তরণে

দিবানিশি লুকিয়ে রাখতে চায়, প্রতি মুহূর্তেই হারাই-হারাই ভয়ে তার প্রেম চকিত, বেদনা-বিহবল। আকাশে চাঁদ-পৃথিবীর বুলবুলিস্তানের কবি-কাউকেও ধরা যায় না" ।[১৪]

"শারাব, সাকি, বুলবুল, খুন, নার্গিস, পেয়ালা, সিরাজি, নহর, মুসাফির, শিরিন, রাঙা, গুলবাগিচা, খঞ্জর, মোবারক, রওশন, গুলিস্তান, মুর্শিদ, দিল, দিলরুবা, গোলাম, হাসীন ইত্যাদি শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত- সহজাত প্রয়োগ কুশলতা গজলগুলোকে সার্থক করেছে। নজরুল ইচ্ছে করে অর্থাৎ কোনো আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে এ সব শব্দ ব্যবহার করেননি। এ শব্দাবলি কোনো ইজমের প্রকাশক নয়, কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গের ধারকও নয়, এমনকি নিষ্প্রাণ আভিধানিক অর্থের দ্যোতকও নয়। শব্দ-প্রবাহের এক অনিবার্যধারায় ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে পংক্তিমালায় স্থান পেয়েছে এ সকল শব্দ । শব্দ-প্রবাহের এই সাবলীলতা ভাবকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে, গজলের একটা আমেজ সৃষ্টি করেছে- গজলগুলোকে অসাধারণ করে তুলেছে। নজরুল ব্যবহৃত শব্দাবলি নজরুলের গজলকে অন্যদের গজল থেকে পৃথক করেছে। 'মধ্যপ্রাচ্যের বেদুইন জীবন, খেজুর গাছ, প্রখর রোদ, ওয়েশিসের শ্যামলিমা তিনি নিয়ে এলেন বাংলাগানের জগতে । বাঙালির কাছে এর স্বাদ নতুন, সুর নতুনতর । শিল্পীর অন্ধ অনুকরণপ্রবণতা শিল্পের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়-এ কথা নজরুলের জানা ছিল। নজরুল ফারসি গজল পড়েছেন, শুনেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন বলে তিনি অন্ধের মত ফারসি গজলের অনুকরণ করেননি। নজরুল সব কিছুই নিজের মত করে নিয়েছেন। নজরুল এখানে আঁদ্রে জিদ কথিত মৌমাছি-হরেক রকমের ফুলকে দলিত মথিত করে মৌমাছি যেমন রূপ দেয় মধুতে এবং সে মধু মৌমাছির নিজের সম্পদে পরিণত হয়, নজরুলের গজলে নানা উৎসের প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও ভাবে-প্রকাশে, ব্যপ্তিতে-ব্যঞ্জনায় একান্তই নজরুলের" ।[১৫]

১৫. পারস্যের গুল, গুলবাগ, গুলিস্তাঁ, বুলবুল, নার্গিস, গোলাব, সরাই, শারাব, সাকী সবই নজরুলকৃত এই গীতিবিচিত্রাতে আছে। এসব শব্দের প্রয়োগ যেনো সুদূর অতীতের ইরানী পরিবেশের কোন মূর্ত চিত্রকল্প। তবে তা যেনো কৃত্তিম নয়-আরোপিত নয় এ বাংলায়। যেমনটি নজরুল 'সবুজপত্র' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'আমি কবিতাটি লিখেছি, পারসিক কবি হাফিজের মধ্যে বাংলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদুগন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই তো খাঁটি বাংলার কথা বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ। শত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির- ভেজা সবুজ বাংলা ।[১৬] তবে প্রেমানুষঙ্গের রূপকাশ্রিত গজল সংখ্যা তুলনামূলক কম।

বরং অধিকাংশ গজল মানব-মানবীর প্রেম, জৈবিক তাড়না, আসক্তি, পাওয়া না পাওয়ার টানপোড়েনে উদগত নিতান্তই রক্তমাংশের Sensuous বা Sensual। সূফী বা বৈষ্ণবীর কুহকের বিভ্রান্তি এতে নেই-আছে জৈব ভাবদ্যোতনা যা দেহগত কামনা-বাসনায় রঙীন। 'দয়িতার চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টির মোহ, তার অঙ্গের সুবাস বুক ভরে গ্রহন করবার ব্যাকুলতা, তাকে ছুঁয়ে দেখার চলিত স্পর্শসুখ, তার বিলোল কটাক্ষে অভিভূত বোধ করবার মদিরতা-

এই সব এবং এই জাতীয় আরও সব পার্থিব অনুভূতি নজরুলের গজল রচনায় কথাবস্তুর মধ্যে এমন ওতপ্রোতভাবে অনুলিপ্ত হয়ে আছে যে, সে সব গানকে স্বর্গীয় ভাব দ্যোতক মনে করার কোনই কারণ নেই । বরং আস্টেপৃষ্ঠে সেগুলি মর্ত্যভাবে জরজর এরূপ মনে করলেই সেগুলির যথাযথ পরিচয় দেওয়া হয় বলে আমাদের ধারনা" । [১৭]

১৬. এদিক দিয়ে নজরুলের গজল এর সংগে ফার্সি গীতিকাব্যের সংগে যতটা মিল তার চেয়ে বেশি নিবিড়তা দেখা যায় উর্দু গজলের রোমান্টিসিজমের । এই বর্গের গজল তাই বলে স্থুলভাবাপন্ন বা Vulgar ভাবার কোন কারণ নেই । এর প্রকাশ অপূর্ব কাব্যস্বাদমন্ডিত তবে তা মাটির কাছাকাছি মানুষের স্বাভাবিক অনুভব-অভিব্যক্তির প্রকাশ । হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা, শূন্যতা, পাওয়া-না-পাওয়া মিলন পিপাসা-আর্তি, বিরহের দীর্ঘশ্বাস, বঞ্চনা, দয়িতের প্রতি আগ্রহ-উদাসীনতা-এ ধরনের ইন্দ্রিয়তা চাওয়া-পাওয়া । 'তোমার বুকের ফুলদানিতে', 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর' , দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়', চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা' 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়, কেগো দরদী, 'এত জল ও কাজল চোখে', 'পথ চলিতে যদি চকিতে', কিংবা 'দাড়ালে দুয়ারে মোর', ঐ ঘর ভুলানো সুরে', ইত্যাদি গজলগুলি সর্বতোভাবে গজলের রূপ বৈশিষ্ট্যে,ভাবে-ভাষায় নিতান্তই মানবিক ও প্রকৃতির প্রেমে মূর্ত । এ প্রসঙ্গে ম.ন মুস্তাফা তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'নজরুল তার প্রেমের গানের এক অভুতপূর্ব সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন । ভাবের গভীরতা এবং চিন্তার ব্যাপ্তি এবং সর্বোপরি যথার্থ শব্দ চয়নে তিনি প্রেমের আকুতিকে বাঙময় করেছেন তাঁর সুরে ও ছন্দে । আশা, হতাশা, পাওয়া, না-পাওয়া প্রেমিক হৃদয়ের এই সংশয় দোলা তার গানের সুরের কাঁপনে যেন জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে । বাংলা সঙ্গীতের প্রেমের গানের ক্ষেত্রে নজরুলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধরা যায় । তাঁকে বাংলার কীটসও বলা হয়ে থাকে' ।

গজল প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'গজলেও তাঁর জুড়ি নেই । ..... নজরুলের গজল পারসীয় ছাঁচে রচিত এবং এতে এর সুর ছন্দের সব নিয়ম কানুন ও মেনে চলা হয়েছে । বাংলা সঙ্গীতে গজল হিসেবে নতুন ধরনের প্রেম-সঙ্গীত আমদানি করে নজরুল বাংলা সঙ্গীত জগতকে নতুনভাবে সম্প্রসারিত করেছেন । [১৮]

হিন্দুস্থানী সংগীতধারায় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীর পরে গজলের স্থান এবং তা লঘু রাগসংগীত রূপে বিবেচিত । এটি মূলতঃ বাণী প্রধান । বাণী যে ভাব বহন করে তাকেই সুর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় । নজরুল তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায় তাঁর গজলগুলিকে অনন্য মাত্রায় স্থাপনে সক্ষম হন । নজরুল তার গজলে অপেক্ষাকৃত হালকা কিন্তু প্রাণমাতানো রাগ-রাগিনী যেমন ভৈরবী, কাফি, পিলু, ভীমপলশ্রী, ধানী, পাহাড়ী, বিহারী, বেহাগ, বাগেশ্রী ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন ব্যবহার করেছেন মিশ্র রাগ বিভিন্ন গোত্রের । উপমহাদেশী রাগ-রাগিনী ছাড়াও তিনি পারসিক সঙ্গীতের 'মোকাম' ও 'গোস্বা' সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন । 'মোকাম'কে উপমহাদেশীয় সংগীতে ঠাট বলে এবং 'গোস্বা' হচ্ছে হালকা ধুন জাতীয় সুর । নজরুল তাঁর কিছু গানে পারসী মোকাম যেমন জংলা, হেজাজ ইত্যাদিও ব্যবহার করেছেন ।

আরবী-পার্সী সুর ব্যবহার করেছেন । 'চমকে চমকে ধীর, ভীরু পায়'-এ আরবী সুর আবার 'বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে'তে ইরানী নৌরচকা সুরের প্রভাব দেখা যায় ।

১৭. ১৯২৬ এর শেষ থেকে ১৯২৭ সালের শেষ পর্যন্ত একবছরের নজরুল রচিত গজলের সুররাগ ভিত্তিক কালানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম, বলেছেন 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' (ভৈরবী), বসিয়া বিজনে কেন একা মনে (মান্দমিশ্র) 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়া (কাফি-সিন্ধু) 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় (জৌনপুরী-আশাবরী), 'এতজল ও কাজল চোখে' (মান্দ), 'করুণ কেন অরুণ-আঁখি (সিন্ধু) 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' (পিলু), 'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে (গারা ভৈরবী), 'আসিল এ ভাঙা ঘরে (পিলু ভৈরবী), কেন কাঁদে এ পরান (মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ), 'চেয়োনা সুনয়না' (রাগেশ্রী পিলু), 'বসিয়া নদী কুলে' (কালাংড়া) । ইত্যাদি । এছাড়া নারায়ণ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন আরো কয়েকটি যেমন, 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর '(ভৈরবী), 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলোনা' (পিলু), 'কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া' (রাগেশ্রী), ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান (বেহাগ) 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয় আজি এ সমাধিতে মোর' (যোগিয়া) ইত্যাদি ।

এসব রাগ-রাগিনীর মধ্যে একটা Wailing বা কান্না প্রবণতার ভাব আছে যার সার্থক ব্যবহারে নজরুল তার গজল বা প্রেমকাব্যগীতিগুলিকে অসাধারণ করে তুলেছেন । এদিক দিয়ে মধ্যযুগের কবি প্রথিতযশা আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫খ্রী.) যাকে এদেশে প্রথম গজল গানের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়-তাঁর সঙ্গে মিল আছে । আমীর খসরুও তার

গজলে পিলু, গারা, সুহা, ফেরদৌস্ত, সুখরাই প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত লঘুরসের হৃদয়কাড়া রাগ-রাগিনী ব্যবহার করেছেন। নজরুলের গজলগুলির বাণী, সুর,শব্দ, উপমা, স্তবকে ও আবেগস্পর্শে একটি পৃথক বিশিষ্টতা অর্জনে সক্ষম হয় । সুকুমার রায় বলেছেন 'গজলতো নজরুলিয়া বলে উল্লেখ করা হতো'। [১৯] নজরুলের নিজের গলা, সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ব্যাপক প্রচার লাভ করে । শ্রীমতি আঙ্গুরবালা দেবী, ইন্দুবালা, বা কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে গজলগুলি হয়ে ওঠে সর্বজনপ্রিয়। বাণী ও সুরের আবেদন কলকাতা শহরের উচ্চশিক্ষিত ধনাঢ্যের ড্রইংরুম থেকে শুরু করে কারখানার শ্রমজীবি মানুষ, গ্রামের সাধারণ মানুষ, গাড়োয়ান, বিড়িশ্রমিক পর্যন্ত সকলকে ছুঁয়ে যায় । এই 'নজরুলিয়া' মানুষের জাত-পাত, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠে, মুখে মুখে ফেরে । গজলকে বাংলা কাব্য ও সঙ্গীতের জগতে একটি পৃথক ধারা হিসেবে চিরস্থায়ী করে যান নজরুল । এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেন, 'বাংলা গানের ইতিহাসে নজরুল ইসলামের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো গজল গানের । গজল উত্তর ভারতে খুব জনপ্রিয় । অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের সঙ্গে গজল কলকাতায়ও এসেছিলো উনিশ শতকে । কিন্তু নিধুবাবু

যেমন টপ্পাকে বাংলা রূপ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, গজলকে সে রকম বাংলা করে নেওয়ার চেষ্টা কেউ করেননি । সেই দায়িত্ব পালন করেন নজরুল ইসলাম । তিনি সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে বন্ধুদের আসরে গজল গাইতে শুরু করেন। তারপর এক সময়ে বাংলাতেই গজল লিখে ফেলেন। তিনি কেবল গজল গানের পথিকৃৎ নন, তিনি বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ গজল গানের রচয়িতা। তাঁর গজল গান এক সময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিলো। বলা হয় যে, এক সময়ে বাংলার শহরে তো বটেই, গ্রামে-গঞ্জেও তাঁর গজল গান ছড়িয়ে পড়েছিলো। [২০]

১৮. নজরুল যেমন বিদ্রোহের কবি তেমনি প্রেমেরও কবি। 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রনতূর্য', তাঁর রচিত অসংখ্য কাব্যগীতিতে প্রেম ও প্রকৃতি ফিরে এসেছে বারবার। এরও মধ্যে নজরুলকে আমরা দেখেছি চিরপ্রেমিক চিরবিরহী হিসেবে তাঁর কবিতা কাব্যের মধ্যে রোমান্টিসিজম, প্রেমজ ভাব-বিহ্বলতা, পাওয়া-না-পাওয়া, প্রিয়ার জন্য হাহাকার, আর্তি, ব্যকুলতা-এগুলোর ব্যাপক প্রকাশ। নর-নারীর ভালোবাসার রসায়ন এবং তার মধ্যে জাগতিক পিপাসার অনুষঙ্গ অনুপ্রাস বহুল ব্যবহৃত। আধ্যাত্মিক ভাব বা অতিন্দ্রীয় ব্যঞ্জনা একেবারে অপ্রকাশিত নয় তবে তা মুখ্যও নয়। রবীন্দ্রনাথের সংগে তার পার্থক্য এখানেই আর বরং তা উর্দু ফারসীর হাফিজ, গালিব, মীরের গজলের সার্থক প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিগণিত। ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহন নজরুল ও কবি গোলাম মোস্তফাকে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। বিভিন্ন আসরে উপস্থিত থেকে গজল ও তার গায়কী-সম্পর্কে একটি ধারনা নজরুল পান। এছাড়াও তানসেন ঘরানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ দবীর খাঁ, দাদরা গজলে পারদর্শী মন্‌জু সাহেব, মাস্তান গামার কাছে রীতিমত সক্রিয় তালিম নিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ কাদের বখসের কাছে থেকে বেশ কিছু অপ্রচলিত রাগ-রাগিনী সংগ্রহ করেন। হুগলীতে থাকাকালে সেতার শিখেছিলেন নজরুল। স্বশিক্ষাতেই আড়বাঁশি বাজাতেন পেশাদারের মত। ১৯২৬ সালের শেষভাগে নজরুলের গজল লেখা শুরু হয়ে ১৯২৮ এ 'বুলবুল' প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত চলে বেশ নিরবিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু এরপরই নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীতে যুক্ত হওয়ার কারণে কোম্পানীর ফরমায়েশ অনুযায়ী রকমারী গান, সুরসংযোজন বা প্রশিক্ষণের কাজে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে রাজ্যেস্বর মিত্রের ভাষায়, 'শীঘ্রই তাঁর গানের মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল'। বাংলা সংগীতে নবসৃষ্ট গজলের এই ধারার প্রতি তিনি আর নিরঙ্কুশ মনোযোগ স্থাপনে সমর্থ হননি। তবে তা থেমে যায়নি-অনেক উৎকৃষ্ট গজলও সেসময় রচনা ও বিভিন্ন গীতিসংকলনে সংযোজিত হতে থাকে। এ বিষয়ে রাজ্যেস্বর মিত্রের আরও দু'টি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেন, 'গত শতাব্দীতে যাঁরা টপ্পা রচনা করেছিলেন তাঁরা তখন বাংলা টপ্পাকে একটা বিশেষ অর্থে পরিণত করেছিলেন, নজরুল তেমনিভাবে গজল পর্যায়ের বাংলা গানকে একটা বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করবার জন্য সচেষ্ট হননি। তিনি যেন কয়েকটি এক্সপেরিমেন্ট করেই থেমে গেলেন।' তিনি আরেকটি দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তার

কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, 'বাংলার জীবন যাত্রায় সুরা, সরাইখানা, বিচিত্র পেয়ালায় পানশালায় বসে একত্রে পানভোজন ইত্যাদি ব্যাপার একেবারেই বিজাতীয় তাই ঠিক সেই ধারায় গজল রচনা করলে নতুনত্বের একটা আশ্চর্য স্বাদ পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু তার বেশী কিছু স্থায়ী হবেনা । নজরুলের ক্ষেত্রে এটাই প্রধানত ঘটেছে, তাই গজলের গতি যেন খানিকটা প্রবাহিত হয়েই অবরুদ্ধ হয়ে গেছে ।[২১]

১৯. এ প্রসঙ্গে লেখক করুণাময় গোস্বামী তাঁর গবেষনায় আরেকটি দিকের অবতারনা করেছেন । তিনি বলছেন, ' যিনি কবি তিনিই তাঁর গানের সুররচয়িতা । কবি নিজেই তাঁর বাণীবন্ধের গভীরতম আকুতিটি সুরের সাহায্যে পরিস্ফুষ্ট করে তোলেন । কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যাবার ঐতিহাসিক মুহূর্তেই বাংলা কাব্য-সংগীত নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা । প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই বাংলা কাব্য সংগীতের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রতিনিধিত্বশীল কবি । এরপর থেকেই প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালী কবিরা সংগীত রচনার ধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন এবং কবির নিভৃত প্রাণের মর্মবাণীকে সংগীতে ধ্বনিত করার পরিবর্তে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় শ্রোতৃচিত্তাভিমুখী সংগীতরচনার এক নতুন সুরপ্রধান যুগের সূচনা ঘটল । গীতরচয়িতা ও সুরকার রূপে একই গানের দুই নির্মাতার আবির্ভাব ঘটল । বাংলা গান এক ধরনের উৎপাদনী ব্যবস্থার করতলগত হয়ে পড়ল । এই যুগ গজল রচনার উপযুক্ত সময় নয় । গজলতো বাণী প্রধান গান, গজল কবির রচনা । বাংলা গানের ধারা থেকে কবিদের বিদায় গ্রহণের ক্ষণে যে কাব্যগীতিধারার সূচনা, সুরপ্রধান ব্যবসায়ী গানের যুগে তার প্রসার না হওয়াই স্বাভাবিক । ফলে টপ্পার ধারায় যা ঘটা সম্ভব হয়েছিল গজলের ধারায় তা ঘটতে পারেনি ।[২২]

২০. বাংলাসংগীতের ধারায় নজরুলের এই থেমে যাওয়ায় আর অন্য কোন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব না ঘটায় বাংলা গজলের স্রোতধারাটি ক্রমান্বয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে । তারপরও কোন কোন সঙ্গীত সমালোচক মনে করেন, 'গজল রচনায় নজরুল এতটা সাফল্য অর্জন করেছেন যে, তিনি যদি গজল ছাড়া আর কোন সঙ্গীত রচনা না করতেন তাহলেও বাংলার সঙ্গীত গগনের ধ্রুবতারারূপে পরিগণিত হতেন' ।[২৩]

তবে নজরুলের সৃষ্ট গজল বাংলা সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং তা ভবিষ্যতের গজল গ্রষ্টাদের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে ।

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুল পরবর্তী গজল চর্চাঃ

১. নজরুল পরবর্তী বাংলা গজল চর্চা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং স্তিমিত । এ প্রসঙ্গে ওপার বাংলার অজয় ভট্টাচার্য- শৈলেন রায়, প্রনব রায় প্রমূহের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । শচীন ভৌমিক তার উর্দু গজলের বাংলা অনুবাদসহ যে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেছেন তার ভূমিকায় বলেছেন, 'মুগ্ধ হয়েছি উর্দু কবিতার বাকসংযম, চিত্রকল্প, কাব্যময়তা ও গভীর

আন্তরিকতায় । কবিতাগুলোয় নারীপ্রেম সুরা ও হতাশা বেশ প্রকট । সত্যি বলতে উর্দু কবিদের এ চারটি হলো সবচেয়ে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র' ।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ নজরুলের গজল গান প্রসংগ আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন 'বাংলায় ইসলামের আগমন কাল থেকেই কিন্তু মাদ্রাসায়/ইসলামী জলসায় গজল চর্চা শুরু হয়ে যায়। সেইসব অখ্যাত-অজ্ঞাত লোককবি ও গীতিকারদের কথা কিন্তু আমাদের লোকসাহিত্যবিশারদরা বলেন না' । এই বিষয়টি গবেষণার দাবি রাখে । এখনও সাধারণ শ্রোতামন্ডলী গজল বলতে কিন্তু কিছু ইসলামী গানকেই বুঝে থাকে । এর-সংগে বোধকরি সুফিজমের আচারে ও প্রসারে গজল কবিতার যে ব্যবহার করা হতো তার ধারাবাহিকতায় মাদ্রাসা/ইসলামী জলসায় এর চর্চা অটুট রয়েছে । আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রশংসায় রচিত হাম্‌দ ও নাত মুলত পরিবেশিত হয় । বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে ফারসি ও উর্দু চর্চা এখনও রয়েছে একারণে সেসকল ভাষা ও বাংলায় গজলগুলির অনুশীলন ও পরিবেশন করা হয় ।

৩. বাংলাদেশে মনিরউদ্দিন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭খ্রী.) বাংলায় 'দিওয়ান-ই-গালিব' অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যে গালিবকে সৃষ্টি করান। এ প্রসঙ্গে লেখক, গায়ক মুস্তাফা জামান আব্বাসী বলেন, ' গজল, কাসিদা, মসনবী, কাতা, রুবাই, নজম ও উর্দু কবিতার ছন্দ সম্পর্কে নব্য বাঙালির পূর্ণ অভিজ্ঞান নেই। অনেক কষ্ট করে তিনি বাঙালী পাঠকদের এগুলো উপহার দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে কেউ করেননি। অবাক হয়ে পাঠ করেছি তার পঞ্চাশটি গজল । দু'টি চরণ :

আহা বসে আছি পিঞ্জর কোনে দু'পাখা রেখেছি মেলে
খাঁচার দুয়ার খুলতো যদি গো বনেতে যেতাম উড়ে
ডাক দিব গিয়ে, 'এসেছি গো আমি' সে দিবে দুয়ার খুলে,
আহা যদি হত তেমন যাওয়াটি সুদূর প্রিয়ার পুরে। [২৪]

৪. গালিবের চর্চা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, সেলিনা হোসেন এরাও। কবি গোলাম মোস্তফা 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী' এর মত কিছু বিখ্যাত গজল লিখেছেন। এছাড়াও মীর মশাররফ হোসেন, মুনশি মেহেরুল্লা, হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রমুখ বাংলায় গজল গান লিখেছেন। লেখক গায়ক আসফদ্দৌলাও বেশ কিছু বাংলা গজল সৃষ্টি করেছেন, গেয়েছেন এবং গাইয়েছেন। তাঁর লেখা ও কম্পোজিশনে গোলাম আলীর গাওয়া বাংলা গজল 'তার সাথে আবার দেখা', 'মেঘ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়' 'এখন তখন হয় যে মন', 'পড়ে কি মনে আমাকে', 'কারে কারে বলি আমি'-আজও জনপ্রিয়।

উপসংহারঃ

একবিংশ শতাব্দীতে এসে সময় বদলেছে। গতি বদলেছে, বদলায়নি মানুষের কষ্ট, মানুষ

আজো নিঃসঙ্গ এবং একাকীত্বই তার সঙ্গী। জীবন যাপন হয়ে গেছে 'জীবিকা যাপন'। যাপিত জীবনের গ্লানি ও ক্লান্তির অবসরেও মানুষ মেঘলা বা ঝরঝর বৃষ্টির দিনে কিংবা গভীর নিশুতিতে কোন এক উপলক্ষ্যে, ভরা জোছনায় গলে পরা রূপালী আলোয়-হয়তো যুক্তিহীন আচম্বিতে কিংবা যতটুকু ফুরসত জোটে সেসময় কোন নদী, পাহাড়, সবুজ বনানীর প্রাকৃতিক শোভাদর্শনের ফাঁকে বিগত উজ্জ্বল দিনের ভালোবাসা, বিলাপ, কি উচ্ছ্বলতা-মানবিক আবেগে ঠিকই অনুরণিত হয় প্রাণে। চঞ্চল হয়ে উঠে মন। 'আমাদের গেছে যে দিনে তা কি একবারেই গেছে-কিছুই কি নেই বাকী'। জমাট কান্নায় ভারী হয়ে যায় বুক। নিরেট বাস্তবতা, নৈতিকতা কিংবা ঔচিত্যের উর্দ্ধে উঠে হৃদয় বলে উঠে 'ইয়ুঁ হোতা তো কেয়া হোতা'-গজল এখানেই প্রাসঙ্গিক। গজল তাই চিরসবুজ, চিরকালের। তাই গজল জনপ্রিয় থাকবেই। নজরুলের পর বাংলা গজলের যে ধারা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে তা যোগ্য উত্তরাধিকারের সচেষ্ট প্রয়াসে অবশ্যই পুনরায় গতিশীল হবে-এটাই আশা।

তথ্যনির্দেশিকা:

নারায়ণ চৌধুরী, কাজী নজরুলের গান- প্রকাশক-মুক্তধারা ।

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, দীওআন-ই-হাফিয, অনুবাদের ভুমিকা, পৃষ্ঠা-৬ ।

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দীওআন-ই-হাফিয, অনুবাদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৩ ।

শামসুল আলম সাঈদ, বাংলায় খৈয়াম ও নজরুল অনুবাদ, পৃষ্ঠা-৯ ।

করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান- বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ।

আবুল হেনা সাদউদ্দীন , সংগীতবিদ্যা, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গান, প্রথম প্রকাশ-২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ইরানের কবি, ২য় সংস্করণ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৫ ।

আলোর বানীবহ নজরুল, 'নজরুল কথা', বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ।

দিলীপকুমার রায়, 'নজরুলগীতি অন্বেষা', কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত, বসুমতী সংস্করণ ১৯৮৫ ।

নারায়ণ চৌধুরী, বাঙালীর গীতচর্চা, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৮৩, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স প্রাঃলিঃ, কলিকাতা ।

মোবারক হোসেন খান, সঙ্গীত প্রসঙ্গ, প্রকাশকাল জুন ১৯৮০, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা ।

রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃজন, নজরুল ইন্সটিটিউট ।

আসাদুল হক, নজরুল যখন বেতারে, পৃষ্ঠা-১৭৬-১৭৭ ।

মোহাম্মদ আবুল খায়ের, নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা, পৃষ্ঠা-৭৬ ।

রওশন আরা মুস্তাফিজ, নজরুল-সংগীত, নজরুল ইন্সটিটিউট ।

নারায়ণ চৌধুরী, কাজী নজরুলের গান, প্রকাশক মুক্তধারা ।

ম.ন মুস্তাফা, আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে, পৃষ্ঠা ২২৪ ।

সুকুমার রায় 'বাংলা সংগীতের রূপ', প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৬৯, এ-মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ পৃষ্ঠা-৭১ ।

গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালীর সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৩৪২ ।

রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নজরুলের সঙ্গীতচিন্তা, দেশ সাপ্তাহিক, সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, কলকাতা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ সংখ্যা।

করুণাময় গোস্বামী ,বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান।

মোহাম্মদ আবুল খায়ের, নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা, পৃষ্ঠা-৭৮।

মুস্তাফা জামান আব্বাসী, গালিবের হৃদয় ছুঁয়ে, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১২।